দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..26 DEC..1985.
পৃষ্ঠা... ...6..কলাম... 1.. ...

সার্বজনীন শিক্ষার ময়লা ছবি

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সচেতন দেশবাসীর দাবী স্বাধীনতারও অনেক আগেকার। উদ্দেশ্য ছিল নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশ ও জনগণকে মুক্ত করা। এ দাবীর বাস্তবায়ন পরাধীনতার যুগে দূরে থাক, স্বাধীন বাংলাদেশের চৌদ্দটি বছর পার হলেও ঘটতে পারেনি। মুক্ত দেশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্য স্থির করা হলেও পরবর্তীকালে এই লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বদলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই পরিবর্তিত নীতি অনুযায়ী ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ এই পাঁচ বছরে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের নব্বুই শতাংশকে স্কুলে ভর্তি করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল। এই লক্ষ্য অর্জিত হলে চলতি সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লাখে পৌছানোর কথা ছিল। সে স্থলে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উননব্বুই লাখ বিশ হাজার। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধি যে মাত্র সাত লাখ 'দৈনিক সংবাদ'-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে সে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। দেশের জনসংখ্যা ইতিমধ্যে নয় কোটি থেকে দশ কোটিতে পৌছে গেছে। সার্বজনীন শিক্ষানীতি ব্যর্থ হওয়ায় দেশে অশিক্ষিতের হার কমার বদলে বেড়েই চলেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার এত নগণ্য হওয়ার মূল কারণ অবশ্যই অর্থাভাব। অর্থাভাবের কারণ আবার প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ব্যর্থতা। প্রয়োজনীয় অর্থ না মেলায় বেসরকারী স্কুলকে সরকারী ব্যবস্থাধীনে আনা, স্কুলের সম্প্রসারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ খুব সামান্যই হতে পেরেছে। শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে যত বই দেয়ার কথা ছিল তাও পুরো দেয়া হয়নি। আবার অনেক এলাকায় বই পৌছাতে বছর প্রায় পার হয়ে গেছে। এক কথায় অর্থের অভাবের সাথে ব্যবস্থাপনার ত্রুটি এবং কাজে গাফিলতি রয়েছে। ফলে অর্থ যতটুকু মিলছে তারও সদ্ব্যবহার হতে পারেনি।

শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা সরকার সম্প্রতি বাড়িয়ে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই বৃদ্ধি অবশ্যই প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু শিক্ষার অগ্রগতির জন্য আর যে যে ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল সেদিকে প্রায় কিছুই করা হয়নি। স্কুল ঘর ভেঙ্গে পড়ছে, মেরামতের খবর নেই। আসবাবপত্র-শিক্ষার সরঞ্জামের অভাব, কেনার জন্য টাকা মেলে না। ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাওয়া আসা করলেও লেখাপড়া শেখে না। কারণ শিক্ষকদের শিক্ষাদানে আগ্রহ কম। কর্তৃপক্ষেরও সেদিকে নজর কম। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার এই তো সাধারণ ছবি। সরকার এই সামগ্রিক অবস্থার বদলের জন্য কার্যকর কোন ব্যবস্থা কি নিতে পেরেছেন? তা যে পারেননি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শোচনীয় ব্যর্থতাই তার প্রমাণ।

শিক্ষার উন্নতির ওপরই দেশের অগ্রগতি যে নির্ভর করে এই বাস্তব সত্য সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর দিয়ে অনুভব করলে অর্থাভাবের প্রশ্ন উঠতে পারতো না। আসলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদ্‌গতির কারণ বুঝবার এবং সমস্যার গভীরে গিয়ে তা দূর করার চেষ্টাও করা হয়নি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ শিক্ষার উন্নতির জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে তা আমাদের কর্মকর্তাদের অজানা থাকার কথা নয়। বিদেশে তাঁরা হামেশাই যাচ্ছেন, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়ে অনেক তত্ত্বকথাও বলছেন। কিন্তু অন্যেরা যা করছে, তা দেখেও নেতারা সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারেননি। তার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্যই কেবল বাড়ছে না, নিরক্ষরের সংখ্যাও অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলেছে। স্বাধীনতার চৌদ্দ বছর পরেও দেশের জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশের বেশী নিরক্ষর এ লজ্জাও সরকারকে স্পর্শ করতে পারেনি।

নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেটা একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায়। নিরক্ষর ও অভাবী লোকদের তা বুঝিয়ে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার আন্তরিক চেষ্টা সরকারের তরফ থেকে করা হয়নি। এই আকর্ষণ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য গরীব ছেলেমেয়েদের কেবল বই দেয়া নয়, তাদের পড়াশুনা করার জন্য আরো কিছু সুবিধা দানের এবং স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাদানে মনোযোগী করে তোলার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশের পল্লীবাসীদের আশি শতাংশেরও বেশী নিরক্ষর এবং অভাবগ্রস্ত। তাদের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ স্কুলে না গিয়ে চাষবাসের কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্য করে কিংবা বাইরে কাজ করে যাহোক কিছু উপার্জনের চেষ্টা করে থাকে। এই বাচ্চাদের স্কুলে আনতে হলে তাদের বাপ-মায়েদের কর্মসংস্থানের ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ বাড়াতে হবে। সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য অর্থের প্রয়োজন সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণ ছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা জনসম্পদ উন্নয়নের মত কোন প্রকল্পই সফল হতে পারে না। সেদিকে খেয়াল রাখলে প্রাথমিক শিক্ষার এ হাল হতে পারতো না।